চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব

প্রফেসর ড. সৈয়দ সামসুদ্দিন আহমেদ

| ঢাকা , শনিবার, ০৯ নভেম্বর ২০১৯

বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বয়সে পঞ্চাশের কাছাকাছি থাকা লাল-সবুজের দেশটি। এখন সব খাতেই লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। ঘরে বসেই বৈশ্বিক খোঁজখবর নেয়া যাচ্ছে।

আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের কারণে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' মানে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনীতি, কৃষি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা; তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ও প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে সব মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ তৈরি করা এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে জনসাধারণের জীবনমানকে আরামদায়ক করে তোলা।

এই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যার স্থপতি হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে প্রখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তিবিদ সজীব ওয়াজেদ জয়। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ তাদের

নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দেয়, ২০২১ সালের মধ্যে স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবে।

এরপর ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই মূলত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। গত ১০ বছরে শিক্ষাসহ সব খাতেই এর ব্যাপক উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে। তাই এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়ন তথা ‘গ্লোবাল ভিলেজে’র অংশ হতে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারও সেভাবেই গড়ে তুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ও।

বাংলাদেশ জনবহুল অথচ ছোট্ট একটি দেশ। এদেশে রয়েছে ৮০ মিলিয়ন (৮ কোটি) যুবক, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বিপুল এই যুব সমাজকে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বলা যায়, এই ৮ কোটি ১৫-৩৫ বছরের যুবক-ই আমাদের বিশাল সম্পদ।

তাদের প্রযুক্তিবান্ধব করেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশের’ জন্য যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কম রিসোর্স (গবেষণার প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সরঞ্জাম) রয়েছে তারা দেশের অন্যান্য বড় কিংবা দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাগাভাগির (শেয়ার) মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। চালিয়ে যেতে পারেন তাদের গবেষণাকর্মও। এতে উভয়পক্ষই লাভবান হবেন। এছাড়া নিজেদের সীমিত সম্পদের মধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির সম্মিলন কীভাবে ঘটানো যায় তা ভেবে দেখতে হবে। মোদ্দাকথা, আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে বিপুল এ তরুণদের বা শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে যা করণীয় সবই করতে হবে।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতেও প্রকৌশল শিক্ষার গুণগত মান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। নজর দিতে হবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও। কারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশে’ ইংরেজি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাতৃভাষা বাঙলার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস প্রণয়নে ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টিও দেখতে হবে। তবে অন্যান্য বিষয়ও থাকতে পারে। তবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়গুলোকে। কারণ বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল

রেভ্যুলেশনের দ্বারপ্রান্তে। এজন্য বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রস্তুতি শুরু করেছে। কেননা এই বিপ্লব শিল্পের নয়, এ বিপ্লব হবে মূলত প্রযুক্তির বিপ্লব।

গত কয়েক বছরে বেশ স্বল্প সময়েই বাংলাদেশ শিক্ষাখাতে তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ‘তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নয়, শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার’ স্লোগানে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও প্রচলিত ধারার শিখন-শেখানো পদ্ধতির পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে; যা প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের চিন্তারই ফসল।

তথ্যমতে, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার স্থাপন করা হয়েছে। এ শ্রেণীকক্ষকেই বলা হচ্ছে ‘মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম’।

কঠিন, দুর্বোধ্য ও বিমূর্ত বিষয়সমূহকে ছবি, অ্যানিমেশন ও ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষকদের একটি কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে ‘শিক্ষক বাতায়ন’ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ‘কিশোর বাতায়ন’। এতে শিক্ষকরা তাদের তৈরি করা ডিজিটাল কনটেন্ট, ভিডিও, অ্যানিমেশন

বাতায়নে শেয়ার করেন এবং অন্যরা প্রয়োজনে তা ডাউনলোড করে নেন। গ্রাম-শহরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বৈষম্য দূর করছে ‘শিক্ষক বাতায়ন’ ও ‘কিশোর বাতায়ন’। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে ‘শিখুন...যখন যেখানে ইচ্ছে’ স্লোগান নিয়ে ‘মুক্তপাঠ’ নামে বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

এ প্ল্যাটফর্ম থেকে আগ্রহী যে কেউ যে কোন সময়ে যে কোন স্থান থেকে অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন। এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। এমনকি দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও ‘মুক্তপাঠ’ থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারছেন।

মুক্তপাঠে অনলাইন কোর্সের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সফলভাবে কোর্সটি সমাপ্ত করে সনদ লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ঘরে বসেই এখন বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা যাচ্ছে। আর মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ দেখভাল ও ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি করা হয়েছে ‘এমএমসি অ্যাপ’।

তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এখন দেশের প্রায় সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরই ওয়েবসাইট রয়েছে। এসব ওয়েবসাইটে হাজিরা খাতা থেকে শুরু করে

ফলাফল সবই ঘরে বসে হাতের ইশারায় মোবাইলের পর্দায় দেখতে পারেন দেশের নাগরিকরা।

তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে আধুনিক ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে রোবটিকস, বিগ ডাটা অ্যানালিটিকস কিংবা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে। এজন্য দেশজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে ১২৯টির মতো বিশেষায়িত ল্যাব।

এখন আমরা বলছি আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সের (এআই) কথা, ভাবছি রোবটিক্স প্রযুক্তির কথা। যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও উদ্ভাবনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে রিঅ্যাওয়ার্ড বা প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নির্দেশ দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণাঋদ্ধ করতে। এজন্য প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সরকারের আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান (২০১২-২০২১) ও ই-লার্নিং কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঘরে থাকা শিক্ষিত নারীদেরও ব্যাপকহারে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করা জরুরি। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি জানা মায়েরাই তাদের সন্তানদের একুশ শতকের মানবসম্পদ হিসেবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন; যা প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসনার নেয়া নারীর ক্ষমতায়নকে আরও জোরালো করবে।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশে’ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের মাধ্যমে এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে ‘Ôknowledge economy’’ এর যুগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করে তুলবে। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রশাসনিক অবকাঠামোতেও গতিশীল ও দুর্নীতি কমে আসবে।

বোদ্ধাদের ভাষ্য, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইন্টারনেট অব থিংসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাই এ শিল্পবিপ্লব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। প্রযুক্তির উৎকর্ষ কাজে লাগিয়ে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হবে শিল্প-অর্থনীতির নানা ক্ষেত্র। মানুষের জীবনকে একধাপেই শতবর্ষ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা জানি, প্রথম শিল্পবিপ্লবের ফলে যান্ত্রিকীকরণের সূচনা হয়। কৃষি থেকে শুরু করে খনিশিল্পের অগ্রগতি সাধন হয়। আর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়; তখন পৃথিবী আলোকিত হয়ে প্রবেশ করে দ্বিতীয় বিপ্লবে।

তৃতীয় শিল্পবিপ্লবটি ছিল ডিজিটাল বিপ্লব। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এর বিস্তার ঘটে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির এ বিস্তারই মূলত বিশ্বজগৎকে মানুষের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এখন

অপেক্ষা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের। এ অবস্থায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমাদেরও ওই বিপ্লবে মানিয়ে নেয়ার জন্য এসব পদক্ষেপ নিতে হবে।

কারণ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় শুধু একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষা অর্জন করলেই হবে না। শিক্ষার্থীদের হতে হবে অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ। যেমন- ইন্টারপার্সনাল ও অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল বাড়াতে হবে। কারণ ওই সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশ আজ প্রযুক্তি খাতে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশের সব প্রান্তে পৌঁছে গেছে ফোরজি ইন্টারনেট প্রযুক্তি; যা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

যোগাযোগমাধ্যম আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে দেশের প্রথম নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১। বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো এটি ব্যবহার করছে। এতে প্রতি বছরে প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচকে ১১৫ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয় ঘোষণা দিয়েছেন- আগামী পাঁচ বছরে এ সূচকে ৫০ ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান। পরবর্তী প্রজন্মকে ‘গ্লোবাল ভিলেজে’র সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি ছিল তার চিন্তায়ও। তাই তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন রাঙামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেছিলেন।

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ দেশের মানুষকে উন্নত জীবন দেয়ার, বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচবার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ভিশন ২০২১, ২০৩০, ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। দিয়েছেন একটি ফ্রেমওয়ার্ক, যার নাম ও ডেল্টা প্ল্যান। নানা অকল্যাণ পরিহার করে প্রযুক্তিবান্ধব জাতি হিসেবে বিশ্বে জায়গা করে নেব আমরা। বাস্তবায়ন হবে শতবর্ষব্যাপী ডেল্টা প্ল্যান। আর এ দেশের মানুষ পাবে তাদের বহুদিনের স্বপ্ন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যে স্বপ্ন দেখতেন আমাদের জাতির পিতা।

[লেখক : উপাচার্য, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর]